হয়েছিল। ফরজানা চলে যাবার পর দিদিরা আর একটা ইস্যু নিয়েছে। কিন্তু সেই শোক আমরা কেউই ভুলতে পারিনি। দিদির ইনসমনিয়া ধরে গিয়েছে। ওষুধ না খেলে রাতে ঘুম আসে না।

রুমকিদি বলল, একটা পার্সোনাল কথা তোকে জিজ্ঞেস করব? তুই কেন বিয়ে করিসনি এখনও?

সাদিক মুখে কিছু বলল না। প্যান্টের পকেট থেকে পার্সটা বের করল। মানিব্যাগের ভিতর থেকে একটা জিনিস তুলে নিল আঙুলে। একটা বাদামি রংয়ের পালক। সেটা দেখিয়ে বলল, এটা কী জানো? ধনেশ পাখির পালক।

রুমকিদি বলল, এটা কোথা থেকে পেলি?

সাদিক একটু হাসল, সেবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি থেকে আমরা সকলে মিলে আজমের শরিফে যাচ্ছিলাম। ট্রেনে এক ফকির বসেছিল আমার পাশে। নেমে যাওয়ার আগে সেই ফকির আমাকে নিজে থেকে দিয়েছিল এটা। বলেছিল সঙ্গে রাখতে। তা হলে নাকি আমার খোয়াইশ পূর্ণ হবে। খোয়াইশ বোঝো তো? মনোবাসনা।

রুমকিদি বলল, তাহলে তো এর দ্রব্যগুণ আছে বলতে হবে। ভালো র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারিতে চান্স পেয়ে গিয়েছিলি তুই। এই মফস্সল শহর থেকে কোচিং ছাড়া এত ভালো রেজাল্ট আর কেউ করেনি তোর আগে কিংবা পরে।

সাদিক দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, ধুস মেডিক্যাল ক্র্যাক করা নয়, আমার মনোবাসনা ছিল ঝুমকিকে বিয়ে করা। তা আর হল কোথায়। তোমরা ওকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিল।

রুমকিদি বড় বড় চোখ করে বলল, তুই এত ভালোবাসতিস ওকে?

সাদিক আপনমনে পালকটাকে দেখল একটুক্ষণ। আবার ঢুকিয়ে রাখল পার্সে। কিছু বলল না। রুমকিদি শূন্য চায়ের কাপটা পাশে রেখে বলল, ঝুমকি তো আর নেই। এখনও ওটা সঙ্গে রেখে দিয়েছিস কেন?

সাদিক বলল, প্রাণে ধরে ফেলতে পারলাম না। ঝুমকিকেও ভুলতে পারলাম না। তুমি কি পেরেছ সুমিতদাকে ভুলতে? নিশ্চয়ই পারোনি। নইলে তো আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতে।

রুমকিদি ক্লান্ত হাসল, ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়!

সাদিক বলল, সুমিতদার কথা মনে পড়ে। কী শৌখিন ছিল মানুষটা! ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখত। ভরাট স্বাস্থ্য। জিমে যেত। মুখে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ধরা পড়ার পর সুমিতদার জিভের অনেকটা কেটে বাদ দিতে হল। চোয়ালের হাড়টাও সরিয়ে দিতে হল অপারেশন করে। অদ্ভুত শেপ হয়ে গিয়েছিল মুখটার। তাকালে গা শিরশির করত। আইসিইউ-তে আমাকে একটা চিরকুট দিয়েছিল সুমিতদা। লিখেছিল — আমি এভাবে বাঁচতে চাই না। তোরা মেরে ফেল আমাকে। সেবার আমাদের অক্লান্ত চেষ্টায় সুমিতদা প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরল। কিন্তু কে জানত ঠিক দু'মাসের মাথায় কুড়ি-পঁচিশটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেবে সুমিতদা!

রুমকিদি বলে উঠল, সুমিত বিয়ের দু'বছরের মাথায় চলে গেল আমাকে ছেড়ে। শোকে তাপে মা-ও বেশিদিন বাঁচল না। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে এসে থাকি স্কুলটা কাছে হয় বলে নয়, অসুস্থ বাবার দেখভাল করব বলে। এই যে এখন বাবা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে, অথচ আমি তোর সঙ্গে গল্প করছি। তুই আমার বাইরের খোলসটা দেখছিস। আমার ভিতরে কি জোয়ারভাটা চলছে সেটা তুই কল্পনা করতে পারবি না।

সাদিক ম্লান হাসল, আমরা সকলেই তো ব্যক্তিগত বিষাদকে সযত্নে আড়াল করে রাখি। আমাদের এক একজনের বিষাদের রং এক একরকম। আমার বাবা-মা দু'জনই চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে। অত বড় বাড়িতে একা থাকি। সময় কাটে না। আমি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ। এই হাসপাতালে এতগুলো বছর কাটাতে কাটাতে জীবনের নগ্ন শেষটুকু দেখতে দেখতে আমার মনটাই আস্ত একটা খণ্ডহর হয়ে গিয়েছে।

রুমকিদি সহমর্মী গলায় বলল, জানি রে সাদিক। বুঝি।

সাদিক বলল, ডাক্তারি পড়ার সময় মানুষের রোগের উপসর্গ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা এ সব পড়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখি অন্য ছবি। যে রোগী সকালে বলছিল ছুটি হলে বেড়াতে যাবে, রাত্রে তার ইসিজি-র লাইন ঢেউশূন্য হয়ে যায়। কলেজে পড়া যে মেয়েটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দেখে ভয় পেয়ে বলে, আস্তে ফোটাবেন ডাক্তারবাবু, পরদিন সে ওটির টেবিলে দাপড়াতে দাপড়াতে মারা যায়, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শরীর ঝাঁঝরা করেও তাকে বাঁচানো যায় না। প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে এই হাসপাতাল আমাকে নির্লিপ্তি শিখিয়েছে। কষ্ট হয়, বুক ভেঙে আসে। কিন্তু আমার ভিতরের ঝড়টা কেউ দেখতে পারে না।

রুমকিদি অস্ফুটে বলল, হাসপাতালের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। ব্লটিং পেপারের মতো আমাদের সমস্ত আনন্দ আর সুখ শুষে নেয়। আমাদের দার্শনিক করে তোলে। আমাদের মেকি অহংকার ধসে যায় এখানে এলে।

সাদিক বলল, ঝুমকির বিয়ের পর মনটা অবসন্ন থাকত। ধীরে ধীরে মানিয়েও নিচ্ছিলাম। কিন্তু ঝুমকি যেদিন চোখের সামন শেষ হয়ে গেল, একটা ছটফটে ঢেউ নিস্তরঙ্গ হয়ে গেল কম্পিউটারের মনিটরে, সেদিন আমার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ওই একটা ঘটনাই আমার জীবনদর্শন আমূল বদলে দিল। তখন জানতে চাইছিলে ঝুমকিকে ভুলতে পারিনি বলেই বিয়ে করিনি কিনা। সেটা খানিকটা সত্য। কিন্তু পুরোপুরি নয়।

সাদিক গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে বলল, মৃত্যু নিয়ে আমার একটা রোমান্টিসিজম ছিল প্রথমদিকে। কিন্তু ঝুমকি, সুমিতদা, তোমার মা, আমার বাবা-মা, ফরজানা ...। আরও কত চেনা অচেনা মানুষ যে শেষ হয়ে গেল চোখের সামনে। এই হাসপাতাল আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে জীবনের সারসত্য। জীবন অনিত্য, মৃত্যু সত্য। মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে এই পৃথিবী, এই জীবন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত বোধ এসেছে। বুঝতে পেরেছি এই অপার্থিব শূন্যতা আমাদের ডাক্তারি সিলেবাসের বাইরের জিনিস।

একটা শববাহী গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে হাসপাতালের সামনে। বডি ওঠানো হচ্ছে ভ্যানে। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা মাঝবয়সি পুরুষের শব। আছাড়ি পিছাড়ি কান্নায় ভেঙে পড়েছে মৃতের স্ত্রী। একগোছা সস্তার ধূপকাঠি জ্বলছে, নীলচে সাদা ধোঁয়া উড়ছে শববাহী গাড়িটাকে ঘিরে। কয়েকটা বিস্কুট রাস্তায় ফেলে দিয়েছে কেউ। একটা আধখাওয়া বেদানা। খানিকটা শুকনো মুড়ি। রোগীর পথ্য ছিল বোধহয়। কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর হামলে পড়েছে সে সবের উপর।

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দু'জন। চায়ের দোকান ছেড়ে এগিয়ে এসেছে হ্যালোজেনের নীচে। সামনের দৃশ্যটির অভিঘাত তাদের জড়িয়ে রেখেছে এখনও। নাটকের শেষে দৃশ্যে এসে পরিচালক যেন 'ফ্রিজ' বলে স্ট্যাচু করে দিয়েছেন দু'জন পীতবর্ণ বিষণ্ণ মানুষকে।

অঙ্কন ঃ অভি

কলেজে পড়া যে মেয়েটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দেখে ভয় পেয়ে বলে, আস্তে ফোটাবেন ডাক্তারবাবু, পরদিন সে ওটির টেবিলে দাপড়াতে দাপড়াতে মারা যায়, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শরীর ঝাঁঝরা করেও তাকে বাঁচানো যায় না। প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে এই হাসপাতাল আমাকে নির্লিপ্তি শিখিয়েছে। কষ্ট হয়, বুক ভেঙে আসে। কিন্তু আমার ভিতরের ঝড়টা কেউ দেখতে পারে না। রুমকিদি অস্ফুটে বলল, হাসপাতালের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। ব্লটিং পেপারের মতো আমাদের সমস্ত আনন্দ আর সুখ শুষে নেয়

অণুগল্প

উচ্চতা

অম্বরীশ ঘোষ

ঝাঁ চকচকে ফাস্টফুডের স্টল। স্বপ্নীল আয়েশ করে বার্গার খাচ্ছিল। বেশ বড়সড় স্টলটাতে অনেক লোক থাকলেও স্বপ্নীল কিন্তু চিন্তিত হচ্ছিল না। চিন্তিত মানে প্রাধান্য না পাওয়ার চিন্তা। ব্রান্ডেড টি সার্ট, জিন্স আর কয়েক হাজারি টাকার জুতো পরা স্বপ্নীলকে সবাই দু'একবার হলেও দেখছিল।

আসলে নিজের সরকারি চাকুরিজীবী হওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ এনজয় করে স্বপ্নীল। বার্গারে কামড় দিতে দিতে দু'একবার এদিক-সেদিকে চোখ যাচ্ছিল ওর।

হঠাৎ দেখে, বেশ কিছুটা দূরে সেই পুরোনো ধাঁচের জামাকাপড় পরা আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির বিমল দাঁড়ানো। কী যেন খাচ্ছে ও একটা। কলেজে একসঙ্গেই পড়ত বিমল। তারপর চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পর থেকে এই সব সাবস্ট্যান্ডার্ড বন্ধুবান্ধবদের সামনাসামনি হলেই জ্বরজ্বর লাগে শরীরটা। স্বপ্নীল দ্রুত আড়াল করে দাঁড়াল বিমলকে। বার্গারের শেষ অংশটা বাকি এখনও। বিমল হঠাৎই সামনে এসে দাঁড়াল স্বপ্নীলের। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস স্বপ্নীল'।

অস্বস্তিতে পড়ে স্বপ্নীল ছোট্ট করে নিজের ভালো থাকার উত্তর দিল। বিমল হেসে বলল, 'তোর খাবারের দামটা দিয়ে দিয়েছি। মাস তিনেক হল ডব্লিউ.বি.সি.এস পাশ করে আধিকারিকের পদে জয়েন করেছি। দেখা হয়নি বলে আর বলা হয়ে ওঠেনি। ভালো থাকিস বন্ধু, চলি'। বার্গারের শেষ অংশটা বড্ড তেতো লাগল স্বপ্নীলের।

অনুরণন

শংকর সাহা

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দে আর মেঘের গুরুগম্ভীরে এক বিশেষ দ্যোতনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির ধারায় মাধবীলতার মনটি কেমন উতলা হয়ে উঠল। বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দে তার মনটি কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

'আপনি একটু অন্যরকম, অন্য সব নার্সদের থেকে আলাদা' সৌম্যের কথায় একটু সচকিত হয়ে ওঠে মাধবীলতা। 'তুমিও একটু অন্যরকম,' প্রত্যুত্তর দেয় সে। মাধবীলতা যখন সৌম্যের বায়োপসির রিপোর্ট দেখে, মনে প্রচণ্ড আঘাত পায় সে। তাড়াতাড়ি একটি মানুষ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে?

সৌম্যের সময় বেশি নেই। এত বড় অপারেশন, তারপরে কেমো আর রেডিয়েশনের ধাক্কা, এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নেওয়া, কিন্তু সৌম্য ভেঙে পড়ে না। জীবনটা যেন তার কাছে একটি খেলা। হয় হারবে, নয়তো জিতবে সে। অপারেশনের দুইদিন আগে থেকে সৌম্য তেমন কথা বলে না। শুধুই বাইরের জগতটাকে ভালো করে দেখে সে।

আর একটু পরে সৌম্যকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। শেষ মুহূর্তে জীবনটাকে খুব প্রিয় মনে হচ্ছে সৌম্যের। আজ যেন বিধাতা তাকে অণু পরিমাণও সময় ছাড় দিতে চায় না। সৌম্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মাধবীলতা। তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে সৌম্য বলে, 'যদি আমি ফিরে না আসি আমার জন্যে কষ্ট পেও না।'

অপারেশন টেবিলে দীর্ঘ দু'ঘণ্টার লড়াইয়ে হেরে গেল সৌম্য।

হঠাৎ পরিচিত হাসপাতালটি বড়ই অসহ্যবোধ হতে থাকে মাধবীলতার। সে বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশে এখনও মেঘের শব্দ। আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে মাধবীলতা। শূন্য অনুভূতি। যেন অনুরণিত হল সেই ডাকে ...। অন্যমনস্ক হয়ে সে হোস্টেলের পথে পা বাড়াল।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক